অবহেলিত শিক্ষার দুর্দশা বাড়ছে

জিয়াউদ্দীন আহমেদ

: শনিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৫

চলতি ২০২৫ সনের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা এইচএসসি এবং সমমান পরীক্ষার ফল সম্প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে। ১১টি শিক্ষা বোর্ডে গড় পাসের হার ৫৮.৮৩ শতাংশ।

> মুহাম্মদ ইউনূস এতগুলো সংস্কার কমিশন করলেন, কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের কোন কমিশনের নাম শুনিনি। শিক্ষার ভিত শক্ত করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক দরকার, কিন্তু স্কুল-কলেজে এখন অধিকাংশ শিক্ষক হচ্ছেন তারা, যারা অন্যত্র ভালো চাকরি যোগাড় করতে পারেন নাী

১২ লাখেরও বেশি পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়, এদের মধ্যে অর্ধেক মেয়ে।গতবারের চেয়ে পাসের হার ১৮ শতাংশ কম। গতবারের তুলনায় কম পাস করায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হৈচৈ হচ্ছে। কারণ ৪১.১৭ শতাংশ পরীক্ষার্থীর অনুত্তীর্ণ হওয়া গ্রহণযোগ্য ফলাফল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।১২ লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫ লাখ ফেল করলে প্রশ্ন উত্থাপিত হবেই। ২০০৫ সনেও গড় পাসের হার ছিল ৫৯.১৬ শতাংশ। কিন্তু ২০০৪

সনে পাস করেছিল মাত্র ৪৭.৮৬ শতাংশ। ২০০৪ সনে পাসের গড় হার এত কম হওয়া সত্ত্বেও জিপিএ-৫ পেয়েছিল প্রায় দেড় লাখ পরীক্ষার্থী, কিন্তু এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র ৬৯ হাজার ৯৭ জন। মাদরাসা বোর্ডে পাসের হার কিন্তু অনেক বেশি, ৭৫.৬১ শতাংশ, গত বছর ছিল ৯৩.৪০ শতাংশ। স্কুলেও দেখেছি, যাই লিখি না কেন, 'দিনিয়াত' পরীক্ষায় আমরা প্রায় সকলে ৯০-১০০ নম্বর পেতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনায় নেওয়া হলে মাদ্রাসার ছাত্ররা অতিরিক্ত সুবিধা পাবে।

পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হওয়ার প্রধান কারণ পরীক্ষার খাতায় যা লেখা হয়েছে তা পাস নম্বরের জন্য যথোপযুক্ত ছিল না। পরীক্ষার খাতায় লিখিত উত্তর যথাযথ না হলে পরীক্ষক নম্বর দেবে কী করে। পরীক্ষার্থীরা এবার নিশ্চয়ই লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিল না, পরীক্ষাকে তারা গুরুত্বও দেয়নি। গণঅভ্যুত্থানে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে, তারা মিছিলে ছিল অগ্রভাগে, স্লোগানে ছিল উচ্চকিত। চব্বিশের জুলাই মাসে তাদের কাজই ছিল ঘুম থেকে উঠেই রাস্তা দখল করা। গুলির মধ্যেও তাদের মধ্যে কোন ভয় ছিল না, রাস্তায় নেমে শুধু স্লোগান দেয়নি, আন্দোলনকে উজ্জীবিত রাখতে তারা রাস্তায় নাটক করেছে, গান গেয়েছে, নেচে নেচে আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরও আন্দোলনের আমেজে তারা নিমগ্ন ছিল। তাদের মধ্যে বিজয় ও কর্তৃত্বের অহঙ্কার জন্মায়, তারা শুরু করে শিক্ষক নাজেহালের মহড়া। এই মহড়ায় জুতার মালা পরিয়ে, টেনে-হিঁচড়ে শিক্ষকদের স্কুল থেকে বের করে দেওয়ার মহোৎসব শুরু হয়। তাদের মধ্যে একটা ধারণা জন্মায় যে, পড়ালেখার দরকার নেই। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ষাটের দশকে শ্রেণিশত্রু খতম করার আন্দোলনের নকশালেরাও তাদের সকল শিক্ষাগত সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলেছিল, নকশাল ছাত্ররা শপথ নেয়, বুর্জোয়া শিক্ষা তারা আর নেবে না।

২০২০ সনে করোনা মহামারীর কারণে বাংলাদেশে এইচএসসি পরীক্ষা হয়নি। জেএসসি ও এসএসসির ফলাফলের ভিত্তিতে যে মূল্যায়ন হয় তাতে সবাই পাস করে। একই মহামারীর কারণে ২০২১ সনেও সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৯৫ দশমিক ২৬ শতাংশ। করোনা

এবং বন্যার কারণে ২০২২ সনেও সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে পাসের হার ছিল ৮৫.৯৫ শতাংশ। করোনার কারণে শুধু এইচএসসি পরীক্ষা নয়, স্কুলের প্রতি ক্লাসেও অটোপাসের নিয়মের বাস্তবায়ন করা হয়। করোনা মহামারীর পর ২০২৩ সনে প্রথমবার কোন বিচ্যুতি ছাড়া পূর্ণ নম্বর ও পূর্ণ সময়ে এইচএসসি পরীক্ষা হয়েছিল, সেবার পাস করে ৭৮.৬৪ শতাংশ শিক্ষার্থী। কিন্তু ২০২৪ সনে সাতটি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়ার পর গণআন্দোলনের কারণে বাকি সাবজেক্টে আর পরীক্ষা নেওয়া হয়নি, এইক্ষেত্রে এসএসসি'র পরীক্ষার নম্বর বিবেচনায় নিয়ে সাবজেক্ট ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে মূল্যায়িত নম্বর দেওয়া হয়। পাসের হার দাঁড়ায় ৭৭.৭৮ শতাংশ।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরও ছাত্রদের আন্দোলন থামেনি, ছাত্রদের শক্তি প্রদর্শনের মহড়া চলতেই থাকে। একনাগাড়ে চলা শিক্ষক নির্যাতন ও তাদের বিতাড়ন থামার পর শুরু হয় ঢাকা কলেজ, সিটি কলেজ, আইডিয়াল কলেজ, মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজ, সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, তিতুমির কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরষ্পরের বিরুদ্ধে লড়াই, এই লড়াই দিয়েই ছাত্ররা তাদের সমস্যার সমাধান খুঁজেছে। এই সকল ঘাত-প্রতিঘাতের উদ্ভব অকস্মাৎ হয়নি, হয়েছে প্রস্তুতি নিয়ে, ঘোষণা দিয়ে। পারষ্পরিক লড়াইয়ের গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার ভিড়ে পাঠ্যপুস্তক পড়ার সময় ছিল না।

সমাজে যারা রক্ষণশীল তারা স্কুল থেকে বেত উঠিয়ে দেওয়াকে মোটেই পছন্দ করছেন না। এদের সংখ্যা কিন্তু কম নয়, কম নয় বলেই মাদ্রাসায় বীভৎস শিশু নির্যাতনেও রাষ্ট্র অস্থির হয় না। মাদ্রাসায় ছাত্রদের হাত-পা বেঁধে, সিলিং ফ্যানের সাথে টাঙ্গিয়ে যেভাবে পেটানো হয় তা রাষ্ট্র এবং সমাজের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয় না। এই রীতির স্বীকৃতি থাকায় স্কুলের প্রথমদিন সন্তানদের শিক্ষকের হাতে তুলে দিয়ে বলা হয়, 'হাড্ডি আমার, মাংস আপনার'। কয়েকদিন পূর্বে একটি শিশুকে একটি উঁচুতলা ভবনের রুম থেকে বের হয়ে জানালা টপকে কার্নিসের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গেল, কারণ শিশুটি মাদ্রাসার পড়ার চাপ সহ্য করতে পারছিল না। শাস্তি দিয়ে পড়ালেখা বা নৈতিকতা শেখানোর কথা পশ্চিমের দেশগুলোতে কল্পনাও করা যায় না। উন্নত দেশগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর শারীরিক বা মানসিক কোন ধরনের নির্যাতন করা হয় না। অথচ জাপান, সুইডেন

প্রভৃতি দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা অসম্ভব অমায়িক, ভদ্র ও বিনয়ী।দুনিয়ার সব উদ্ভাবন ও আবিস্কার তারাই করে।

মুখস্ত বিদ্যা দিয়ে নতুন সৃষ্টি সম্ভব নয়। চীন ও জাপানের শিশুরা স্কুলে ভর্তি হয়ে শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়ে না, নিজেদের দৈনন্দিন সব কাজ নিজেরাই করে। এই ধরনের পোস্টে দেখি হাজার হাজার ‘লাইক’ এবং ইতিবাচক কমেন্ট। আওয়ামী লীগ আমলে এমন একটি শিক্ষা কারিকুলাম প্রবর্তন করার চেষ্টা করা হয়েছিল, অসংখ্য লোক সেই কারিকুলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। সেই কারিকুলামে বাড়াবাড়ি বা অপূর্ণতা থাকলে তা সংশোধন করা যেত, কিন্তু সেদিকে কেউ গেল না, সবাই মুখস্ত পরীক্ষার পক্ষে থাকল। আমরা স্কুল ও কলেজ পরীক্ষায় হরলাল রায়ের ‘বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা’ বই থেকে মুখস্ত করে রচনা লিখতাম, ভাবসম্প্রসারণ করতাম, চিঠি লিখতাম, সবার এক রকম হতো। বানান ভুলের পরিমাণ আর লেখার স্পষ্টতা বিচার করে শিক্ষক নম্বর কম বা বেশি দিতেন। তাই আমাদের মধ্যে কোন সৃজনশীল মেধা নেই, আছে মুখস্তের পর বমি করার দক্ষতা। আমার এক নাতি ল-নের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারি পাস করে এখন আমেরিকায় প্র্যাকটিস করে, সে যখন সপ্তম শ্রেণির ছাত্র তখন আমি ল-নে গিয়ে তাদের বাসায় কয়েকদিন ছিলাম। একদিন স্কুল থেকে আসার পর তাকে ইন্টারনেট নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখলাম, জিজ্ঞেস করে জানলাম তার ‘বাড়ির কাজ’ নিয়ে সে একটি প্রতিবেদন তৈরি করছে, প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু হচ্ছে, ‘জেরুজালেম কেন ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের নিকট সমান গুরুত্বপূর্ণ’। ইন্টারনেট ঘেটে ইংরেজি ভাষায় সে যে প্রতিবেদন তৈরি করল তা আমাদের দেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের পক্ষেও তৈরি করা সম্ভব কি-না সন্দেহ আছে।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার উপর মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না, ভিত শক্ত হয় না বলে পড়ালেখার উপর অনেক ছাত্র-ছাত্রীর আগ্রহ থাকে না, বিতৃষ্ণা জন্মে। সরকার বিনে পয়সায় বই দিচ্ছে, কিন্তু শিশুদের অপুষ্টি দূর করার কোন পরিকল্পনা কোন সরকারের আমলেই ছিল না। আওয়ামী লীগ সরকার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের দুপুরে খিচুড়ির দেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল, কিন্তু তা আমলারা ভ-ুল করে দেয়, খিচুড়ির রান্না আর বিতরণের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আমলারা বিদেশে যাওয়ার শর্ত দিয়ে প্রকল্প প্রণয়ন

করে। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও দেখা যায়, প্রকল্পের অধীনে সকাল-বিকাল আমলারা বিদেশে যাচ্ছে। মুহাম্মদ ইউনূস এতগুলো সংস্কার কমিশন করলেন, কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের কোন কমিশনের নাম শুনিনি। শিক্ষার ভিত শক্ত করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক দরকার, কিন্তু স্কুল-কলেজে এখন অধিকাংশ শিক্ষক হচ্ছেন তারা, যারা অন্যত্র ভালো চাকরি যোগাড় করতে পারেন না। যারা মেধাবী শিক্ষক তারাও হতাশাগ্রস্ত। কারণ তারা যে বেতন ও ভাতা পান তা সরকারি অফিসের একজন করণিকের চেয়েও কম। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির দাবী শিক্ষা উপদেষ্টা কয়েকদিন আগে নাকচ করে দিয়েছেন, কারণ সরকারের কাছে টাকা নেই।টাকা না থাকলে সরকার শিক্ষকদের বেতনভাতা বাড়াবে কিভাবে? তাহলে অসংখ্য লোকের সমভিব্যাহারে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের ১৪ মাসে ১৪ বার বিদেশে যাওয়ার পয়সা আসে কোত্থেকে, প্রকল্পে সন্নিবেশিত চাতুর্যপূর্ণ শর্তাধীনে আমলারা অহর্নিশ বিদেশে যাচ্ছেন কিভাবে, ভবিষ্যত সরকারের মন্ত্রীদের জন্য বিলাসবহুল গাড়ির ক্রয় করার প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রনালয় নাকচ করার পরও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় নব উদ্যমে আবার ক্রয়ের বাজেট পায় কোথায়?

১৯২৪ সনে আমার বাবা আবদুর রশীদ মাস্টার কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ফেনী জি এ একাডেমী স্কুল থেকে এন্ট্রাস পাস করে চাকরি করার কোন আগ্রহ দেখাননি। তিনি ১৯২৬ সনে আমাদের জিএমহাট এলাকায় স্থানীয় জমিদার ও এলাকাবাসীর সহযোগিতায় একটি মাইনর স্কুল (ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জিএমহাট মাইনর স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষকও ছিলেন। ৬৫ টাকা বেতনে তিনি অবসরে যান। পাঁচ ভাই দুই বোনের মধ্যে আমি সবার ছোট, আমিও আমাদের সংসারে চরম অভাব দেখেছি। বৃত্তি পেয়ে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম বলেই আমাদের লেখাপড়া করা সম্ভব হয়েছিল। শিক্ষা লাভের এই ব্রতের পরিপালন সব পরিবারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে স্থানীয় মান্যবর ব্যক্তিগণ শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন বলেই তাদের নেতৃত্বে ঘরে ঘরে গিয়ে স্কুলের ছাত্র, এলাকার যুবকেরা মুষ্টি মুষ্টি ধান-চাল সংগ্রহ করেছেন। এখন আর আগের মতো শিক্ষালয়ের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক নেই, সরকারও উদাসীন। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়, ফেল বেশি হলে শিক্ষকদের দায়ী করা হবে।

শিক্ষকরা হয়ে গেল চতুর, লেখাপড়া প্রদানে অধিকতর মনোযোগী না হয়ে পরীক্ষার খাতায় ভুল উত্তরেও নম্বর দেওয়া শুরু করলেন। অথর্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও খুশি, শিক্ষকও দায়মুক্ত।

একাত্তরে স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সনের প্রতিটি পরীক্ষায় দেদারছে নকল হয়েছে, পাসের হারও ছিল বেশি। শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সনে শিক্ষাবিদ আবুল ফজলকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেন, ১৯৭৩ সনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোর স্নাতক পরীক্ষায় পাসের হার ছিল মাত্র ২ শতাংশ। বঙ্গবন্ধু ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছিলেন, 'দুই শতাংশ পাস করানোর মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই, শতভাগ কেন পাস করে না তার সমাধানে সমন্বিত উদ্যোগ জরুরী'। বঙ্গবন্ধু নিহত হলে সেই উদ্যোগ আর নেওয়া হয়নি। স্বল্প মেয়াদের অন্তর্বর্তী সরকারও শিক্ষা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না, স্বৈরাচার আর ফ্যাসিস্টের উত্থান রোধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ভীতিজনক দেড়টা বছর তারা স্বপ্ন দেখিয়ে দেখিয়ে কাটিয়ে দিল। শিক্ষার সামগ্রিক চেহারা খারাপ হলেও ভালো ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষকদের আন্তরিকতা থাকলে শিক্ষার্থীর বিচ্যুতি রোধ করা যে সম্ভব তা দেখিয়ে দিয়েছে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, পাসের হার ৯৯.৯৪ শতাংশ, সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, পাসের হার ৯৯.৯১ শতাংশ। নটরডেম কলেজ, পাসের হার ৯৯.৬০ শতাংশ। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, পাসের হার ৯৭.৫৬ শতাংশ। আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মতিঝিল,পাসের হার ৯৮.২৪ শতাংশ।এমন আরও বহু কলেজ আছে। কিন্তু ধনী পরিবারের প্রাইভেট পড়া ছাত্রদের স্কুলগুলোর ভালো ফলাফল দিয়ে জাতির শিক্ষার মান নিরূপণ সম্ভব নয়, গ্রামের শিক্ষার মান ধীরে ধীরে তলানিতে নেমে যাচ্ছে, দুই শতাধিক কলেজে একজন পরীক্ষার্থীও পাস করেনি।

[লেখক: সাবেক নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক; সাবেক এমডি, টাকশাল]